চিত্ত-কথা

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী

চিত্ত-কথা

সিরাজগঞ্জ

তারকেশ্বর

কলিকাতা

বেলগাঁও

পাটনা

ফরিদপুর

দার্জ্জিলিঙ

রাজর্ষি চিত্তরঞ্জন

তরুণ চিত্তরঞ্জন

মৃত্যুহীন চিত্তরঞ্জন

শিয়ালদহ

জনতা

পুরমহিলাগণের শ্রদ্ধাঞ্জলী

চিতা

নিবেদন

চিত্ত-কথার কথাগুলি চিত্তরঞ্জনের নিজের মুখের কথা, লেখকের নয়; এইটাই এই পুস্তকখানির বিশেষত্ব। আর একটি, লেখক চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে থাকিয়া যে অবস্থায় যখন যে কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন, তাহাই অতিশয় সরলতা ও শ্রদ্ধার সহিত এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিছুই গোপন করেন নাই, কোনও কথাই কথার জালে উল্টা করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। লেখক নিজেকে কোথাও বিচারক বা উপদেষ্টার আসনে বসাইয়া আপনাকে জাহির করিতে প্রয়াস করেন নাই। সেই জন্যই আমরা এই পুস্তকখানি অতি আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি।

মানুষের জীবন-স্রোত দুই বিরাট রহস্যের মাঝখানে বিচিত্র-লীলা, কর্ম্ম এবং কলধ্বনি লইয়া অবিরত বহিয়া চলে; তাহার একপ্রান্ত জন্মশিখরে, আর এক প্রান্ত মরণ-সমুদ্রে।

এই জীবন-যাত্রায় মানুষের দুঃখ বিচিত্র, তাহা গভীর, অনেক সময়ে তাহা সহনাতীত; এই সংসারে তাহার বেদনার সীমা যেন সম্পূর্ণ করিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু এ দুঃখ ক্ষুদ্রের নহে। মহতেরই গৌরব এই দুঃখ। মনুষ্যত্বই সেই দুঃখের মহিমায় মহীয়ান্ অশ্রুজলেই এই মনুষ্যত্বের রাজ্যাভিষেক। এই অভিষেক-দিনে বিধাতা নিজে মানুষের মস্তকে মৃত্যুর মুকুট পরাইয়া দেন, তাই মানুষ অমরত্বলাভ করে, অমৃত হয়।

এই মনুষ্যত্বের পথে যাঁহারা অকপট অন্তরে অগ্রসর হইতেছেন, চিত্ত-কথার কোনও না কোনও কথা তাঁহাদের অন্তরের সংশয় দূর করিতে পারিবে বলিয়াই আমাদের আশা।

বিনীত

প্রকাশক

দেশবন্ধু সম্বন্ধে এই সকল স্মৃতিকথার কতকগুলি আমি পড়িয়াছি। স্বর্গগত এই দেশপ্রেমিকের স্মৃতিকে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের নিকট তাঁহার সম্বন্ধে সকল কিছুই আনন্দ ও আগ্রহের বিষয় হইবে।

৪ঠা আগষ্ট, ১৯২৫,
কলিকাতা

এম্, কে, গান্ধি

এনেছিলে সাথে ক'রে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
করি গেলে দান।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ কনফারেন্স উপলক্ষ্যে দাশ মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। আমি সেই সময় সিরাজগঞ্জে হিন্দু-মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির চ্যায়ারম্যান-স্বরূপে দাশ মহাশয়কে আমন্ত্রণ করিতে তাঁহার বাসায় যাই। তিনি সবে মাত্র পৌঁছিয়াছেন, ঘরভরা লোক, আমি ভিড় ঠেলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হিন্দু-সভায় উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি স্বাভাবিক স্মিত হাস্যে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং এই হিন্দুসভা উপলক্ষ্যে যাহাতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ঘটিতে না পারে এ বিষয়ে আমাকে পুনঃপুনঃ বলিলেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর সিরাজগঞ্জে আগমন উপলক্ষ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের একদলের মধ্যে একটা বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এই বিষয়ে স্বামীজীর সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়কে তিনি আমার সঙ্গে দিলেন। আমি দাশ মহাশয়ের নিকট বিশেষ পরিচিত ছিলাম না, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে এমন নিকট আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিলেন যে, আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলাম; কারণ ইহার পূর্ব্বে আমার সম্পাদিত 'জনসেবক' নামক পত্রে আমি তাঁহাকে শিষ্টতার সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক ব্যক্তিগত আক্রমণ করিয়াছিলাম এবং তিনি তাহা জানিতেন।

দাশ মহাশয় বলিলেন,—শুদ্ধি আন্দোলন নিয়েই যত গোলযোগ। স্বামীজী পাঞ্জাব থেকে এসেছেন, সেখানে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। সে অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য বেড়েই চলেছে, কিন্তু বাঙলাদেশ মুসলমান প্রধান, এখানে যদি এই শুদ্ধি আন্দোলন আরম্ভ করা যায় তা হ'লে বিপদের আশঙ্কা খুব বেশী। এই কথা তিনি স্বামীজীকে বলিতে বলিলেন।

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়কে সঙ্গে লইয়া আমি স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। দাশ মহাশয়ের কথা তাঁহাকে বলিলাম। এই বিষয়ে তাঁহার সহিত প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা

হইল। কোনরূপ সাম্প্রদায়িক বিরোধ যাহাতে না ঘটে সে বিষয়ে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিবেন বলিয়া আমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ইহার পরে অপরাহ্ন তিনটার সময় সম্মিলন মণ্ডপে দাশ মহাশয়ের সঙ্গে আমার দেখা। চারিটার সময় প্রাদেশিক সম্মিলন আরম্ভ হইল। ঐ দিন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও মূল সভাপতির অভিভাষণ পাঠ হইতে হইতে রাত আটটা বাজিয়া গেল। তাহার পরই হিন্দুসভার অধিবেশন হইবার কথা। আমরা দেরী দেখিয়া একটু চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। দাশ মহাশয় বলিলেন,—দেশের কাজ করিতে এসে এত চঞ্চল হলে চলে না, রাত তিনটে বেজে গেলেও হিন্দুসভার কাজ শেষ করে বাসায় যাবে।

প্রাদেশিক সভার বাকী কাজ শেষ করিয়া হিন্দুসভার কাজ আরম্ভ করিতে রাত নয়টা বাজিয়া গেল। প্রথমেই আমার অভি-ভাষণ পড়িবার পালা। আমি দাশ মহাশয়ের অনুমতি লইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমার অভিভাষণ শেষ হইলে তিনি আমাকে জানাইলেন, আমার অভিভাষণ শুনিয়া তিনি খুব খুশী হইয়াছেন।

তাহার পর সভাপতি নির্ব্বাচন। হিন্দুসভার সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া একটু গোলযোগ হইল। সেই গোলযোগ মিটাইয়া সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে করিতে রাত এগারটা বাজিয়া গেল। সে দিনকার

মত সভার কাজ শেষ করিয়া তিনি বাসায় গেলেন। সারাক্ষণ তাঁহার উৎসাহের একটুও হ্রাস দেখি নাই।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণ চারিটার সময় প্রাদেশিক সম্মিলন আরম্ভ হইল। সেই দিনই 'প্যাক্ট' পাশ করিবার কথা। এই দিন তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইলাম। Sense of invincibility ও strength of conviction-এর অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তিনি জানিতেন যে, বাঙলা-দেশ মুসলমান প্রধান, এখানে মুসলমানের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া বাঙালী জাতির গঠন হইতে পারে না এবং এই সত্যটি তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

সে দৃশ্য এখনো আমি চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। জ্যৈষ্ঠ মাস, অসহ্য গরম,প্রায় দশ হাজার লোক, বেলা চারিটা হইতে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত সমভাবে একাসনে বসিয়া আছে! প্রতিপক্ষের অনলবর্ষী বক্তৃতার চোটে আমরা যাই-যাই হইয়াছি। সবশেষে পুরুষসিংহ তাঁহার Right-of-reply দিতে উঠিলেন। তখন সারা মণ্ডপ তাঁহার মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাল বক্তৃতা দিয়া অধিকতম সদস্যের মত লইয়া তিনি 'প্যাক্ট' পাশ করিয়া লইলেন; মুখে জয়-গৌরবের বিপুল উল্লাস, তার সঙ্গে সত্য রক্ষার পরম আত্মপ্রসাদের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে!

আমরা পায়ের ধূলা লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি করিয়া এ সম্ভব হল ?

তিনি স্মিতহাস্যে বলিয়া উঠিলেন,—তোমরাও পারতে, যদি তোমাদের Right ground কোথায় তা বুঝতে !

দুই কনফারেন্স ত হইয়া গেল। দ্বিতীয় দিন হিন্দুসভার অধিবেশন বেলা একটা থেকে আরম্ভ হয়। ঐ দিন সকাল বেলা সভা-মণ্ডপের সম্মুখে একখানা গরুর ঠ্যাং পাওয়া যায়, ফলে হিন্দুদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। অপর পক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের একদল স্বেচ্ছাসেবক সকাল হইতেই লাঠি লইয়া দল বাঁধিয়া কুচ্ করিতে লাগিল—খুব high tension. শ্রদ্ধানন্দজীকে স্বেচ্ছাসেবকগণ ঘিরিয়া সভায় লইয়া আসিল, দাশ মহাশয়ও আসিলেন। শ্রদ্ধানন্দজী পূরা একঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। অনেকেরই ভয় ছিল যে, স্বামীজীর বক্তৃতার ফলে এই সময় একটা সাম্প্রদায়িক বিরোধের সূত্রপাত না হয়, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই প্রীত হইল।

এই সময় কলিকাতার পতিতা নারীদের পক্ষ হইতে একখানা টেলীগ্রাম আসিল। টেলীগ্রামে হিন্দুসভার সাফল্য কামনা করিয়া হিন্দুসভার আশ্রয় প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই টেলীগ্রামখানা সভায় পড়া উচিত কিনা ইহা লইয়া সভায় তুমুল তর্ক উপস্থিত হইল। শ্রদ্ধানন্দজী টেলীগ্রাম পড়িবার স্বপক্ষে মত দিলেন, দাশ মহাশয়ও

তাঁহাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন,—তারা পতিতা বলে কি হিন্দুসভার উদ্দেশ্যে সহানুভূতি ও জানাতে পারে না? তারা যখন হিন্দুসভার আশ্রয় প্রার্থনা করেছে, তখন তাদের সে আশ্রয় দিতেই হবে। পরে আমাকে বলিলেন,—পতিতাদের পক্ষ থেকে যে টেলীগ্রাম করেছে, কলকাতা যেয়ে তার সঙ্গে দেখা করে তারা কি চায় জানবে। এ কথার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে চাপা হাসির সাড়া পড়িয়া গেল ও ঠাট্টার মৃদুগুঞ্জন শোনা গেল। আমি ভারী ম্রিয়মাণ হইয়াই পড়িলাম। তিনি আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—দেশের কাজ করতে এসেছ, অন্যের উপহাসে তোমার কি এসে যায়!

তারকেশ্বর

সিরাজগঞ্জ হইতে ফিরিবার পথে আমি তিন দিন পাবনায় বিশ্রাম করি। কয়দিনের উদ্বেগে উত্তেজনায় আমি একটু অসুস্থ হইয়াই পড়িয়াছিলাম। কলিকাতা ফিরিয়া দাশ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতেই তিনি বলিলেন,—এ ক'দিন কোথায় ছিলে?

আমি পথে বিশ্রাম করার কথা বলিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—দেশের কাজে বিশ্রাম কোথায়? আমি তোমাদের চাইতে বুড়ো, এর মধ্যে সিরাজগঞ্জ থেকে ফিরে তিনবার তারকেশ্বর গিয়েছি

তখন তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ পূরো দমে চলিতেছে, দলে দলে বাঙলার যুবকগণ জেলে যাইতেছে। এই সময় একদিন শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি তাঁহার সঙ্গে সত্যাগ্রহ কমিটির মিটিং-এ তারকেশ্বর যাই। হাওড়া ষ্টেশনে তাঁহার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিলাম, সঙ্গে ডাক্তার দাশগুপ্ত ছিলেন।

হাওড়া ছাড়িবার পর ডাক্তার দাশগুপ্ত আমার "বোলশেভিক-বাদ" হইতে দুখানা ছবি তাঁহাকে দেখাইলেন। আমার বইখানি সবেমাত্র বাহির হইয়াছে, তাঁহার অনুমতি লইয়া সেখানা তাঁহার নামেই উৎসর্গ করা হইয়াছে। আমি বোলশেভিকবাদ সম্বন্ধে কথা পাড়িলাম। বলিলাম, টাস্কেণ্ডে বোলশেভিকরা যেরূপ আড্ডা গাড়িয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষে তাহাদের আসিতে আর বড় দেরী হইবে না।

তিনি বলিলেন, টাস্কেণ্ড থেকে বোলশেভিকদের আসা নিয়ে আমি মোটেই ভাবি নে, আমি দেখছি, আমার সামনেই বোলশেভিক ব'সে আছে।

আমি বলিলাম, আপনি ঠাট্টা করিতে পারেন, কিন্তু তা না হইয়া আর উপায় কি ? এই বলিয়া বোলশেভিকদের স্বপক্ষে বই-পড়া যত মামুলি মত—ধনিকের অত্যাচার, মূলধনের কেন্দ্রীভূত অবস্থা, শ্রমিকদের শোষণ, ধর্ম্মের নামে লোক ঠকান, অভিজাত সমাজের স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি এক নিশ্বাসে বলিয়া গেলাম।

তিনি একটু হাসিলেন, তারপর একটু বাদে বলিলেন,—ইউরোপের এই বোলশেভিকবাদ ভারতবর্ষে টিকবে না, কারণ তোমরা ভারতের সমাজের যে কি প্রাণ তা জান না, বাইরে থেকে যা আমদানি করতে চাইছ, তা এদেশের মাটিতে ভাল ফলবে না, আগাছা হয়ে জঞ্জাল আরও বেশী বাড়িয়ে তুলবে। সমাজতন্ত্রই ভারতের প্রাণ। ভারত কোন দিন তার ভাইদের খেতে না দিয়ে নিজের পেট ভরাবার চেষ্টা করে নি। সকলকার মধ্যে সমানভাবে তার ধন-বিভাগ করে আসছে। ধনীর অর্থ চিরদিনই দরিদ্রের জন্যে উন্মুক্ত ছিল। অতিথি কখনো বিমুখ হয়ে ফিরে যেত না। গ্রাম্য সমবায়ে সাধারণ পুষ্করিণী, দেবালয়, মন্দির মসজিদ, পাঠশালা, টোল, মক্তব প্রভৃতি শিক্ষার কেন্দ্রগুলি গ্রামের সকলকার অর্থেই পুষ্ট হত, গ্রামের জমিদার এ সব অর্থ সংগ্রহ করে যার যা প্রাপ্য, দিতেন। গ্রাম্য পঞ্চায়েতেই গ্রামের বিবাদ মিটাত। কথকতা, চণ্ডী, জারি, কীর্ত্তন গানে লোকশিক্ষার প্রভূত সাহায্য হত। আজ যদি তোমরা সে সব কাজের ভার খবরের কাগজের হাতে তুলে দাও এবং একান্নবর্ত্তী পরিবার ভেঙ্গে ফেলে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার গণ্ডীকেই শ্রেয় বলে মনে কর, তা হলে ভারতবর্ষের গলা টিপে মেরে ফেলা হবে। আমার স্বরাজের আদর্শ এই যে, সেখানে প্রত্যেকেই খেতে পাবে, কেউ না খেয়ে থাকবে না, কারুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে কিছু মাত্র বাধা থাকবে না।

স্বাধীন অথচ পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে সৌভ্রাত্রে ভারতের সমাজ আবার গড়ে উঠবে, সমগ্র দেশ সাধারণের ভূসম্পত্তি হবে। আর তুমি যে বল্লে, অর্থের কেন্দ্রীভূত অবস্থাটাই যত বিরোধের কারণ; কার্য্যত আজ তাই দাঁড়িয়েছে বটে কিন্তু আসলে এ দেশে অর্থ কোন দিনই কেন্দ্রীভূত হত না, কারণ ধন-বিভাগের ব্যবস্থা এতই সুষ্ঠু ছিল যে, বাপ মরে গেলে তাঁর সঞ্চিত অর্থ সকল ছেলের মধ্যেই সমান অংশে ভাগ হয়ে যেত। এই ক্রমবিভাগের দ্বারাই সামঞ্জস্য রক্ষিত হত, ধনিকের প্রাধান্য কোন দিনই হবার সুযোগ পেত না। * * * *

কথা শুনিতে শুনিতে অনেকটা দূর আসিয়া পড়িলাম, পথে যত জায়গায় গাড়ী থামিতেছিল, স্কুলের ছেলেরা ছুটি পাইয়া দলে দলে ফুলের মালা স্তবক ইত্যাদি লইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্যে আসিতেছিল। ক্রমেই ভিড় বাড়িয়া চলিল। এই সময় একটা ষ্টেশন থেকে স্বামী সচ্চিদানন্দ উঠিলেন, তখন আমাদের কথা চাপা পড়িয়া গেল। তারকেশ্বর সম্বন্ধেই কথা চলিল। স্বামী সচ্চিদানন্দ তখনো আমাদের বিরোধী হইয়া উঠেন নাই; তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনিই তারকেশ্বরের মোহান্ত হইয়া গদিয়ান হইবেন। তখনো তাঁহার এই ইচ্ছায় কিছুমাত্র বাধা আসিয়া পড়ে নাই। সেইজন্য তিনি তখনো প্রাণপণেই আমাদের সাহায্য করিয়া আসিতে-ছিলেন।

আমরা যথাসময়ে তারকেশ্বর পৌঁছিলাম। নর-নারীর মুখে একটা সশ্রদ্ধভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, অধর্ম্মের হাত হইতে ধর্ম্ম মন্দিরের পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা হইতে চলিয়াছে। এই কারণে দেশবন্ধুর প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ভক্তির আর সীমা ছিল না।

ষ্টেশন হইতে মন্দিরে পৌঁছিতে আমাদের আধ ঘণ্টা লাগিয়া গেল। এতই লোকের ভিড়! সকলেই তাঁহার পায়ের ধূলা লইতে চায়।

সেখানে পৌঁছিয়া কমিটির মিটিং শেষ করিয়া তিনি পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে সমস্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলেন ও যথাযথ উপদেশ দিলেন। সন্ধ্যার ট্রেনে আমরা কলিকাতায় ফিরিলাম।

ভম্বল (চিররঞ্জন) তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে কারাবরণ করিয়াছে। যখনই ভম্বল জেলে কেমন আছে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তখনই জবাব দিয়াছেন, বেশ ভাল আছে। অথচ জেলে ভম্বলের আমাশা হইয়াছিল ও খুব কষ্টে ছিল তাহা তিনি জানিতেন। এক দিনের জন্যও নিজ পুত্রের জন্য তাঁহাকে উদ্বিগ্ন হইতে দেখি নাই; বরং সত্যাগ্রহে ছেলে কারাবরণ করিয়াছে বলিয়া তাঁহার মুখে আমরা পরম আত্মপ্রাসাদের ভাবই দেখিয়াছি।

ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি, সে দিন জন্মাষ্টমী। আমি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই।

শরৎবাবু তাঁহার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকিলেন, আমি বাহিরেই বসিলাম। শরৎবাবুর সহিত কথা-বার্ত্তায় রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল। একবার তিনি বাহিরে আসিলেন, আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—তুমি বাইরে বসে কেন? কতক্ষণ এসেছ? ভেতরে এসো। ভেতরে গিয়া শরৎ বাবুকে বলিলেন, শৈলেশকে বাইরে বসিয়ে রেখেছেন কেন? ঘরে আর কেউ নাই, আমরা তিন জন। বিপ্লববাদীদের সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল। তিন আইনের বন্দীদের মধ্যে অনেকেরই নাম করিয়া তাঁহাদের মতামতের কথা বলিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন,—হিংসার পথে আমাদের কিছু হবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি অহিংসভাব policy হিসাবে মানেন, না প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, অহিংসার দ্বারাই দেশ স্বাধীন হবে?

তিনি বলিলেন,—তোমাদের বয়সে আমিও অহিংসা মানি নি। এখন সত্যই বিশ্বাস করি যে, অহিংসা ছাড়া আমাদের অন্য পথ নেই। যাঁহারা তিন আইনের বন্দী তাঁহাদের নাম করিয়া বলিলেন,—এঁরা প্রত্যেকেই কত বড় কর্ম্মী, ত্যাগী, দেশপ্রেমিক, দেশের জন্য কত দুঃখ সয়েছেন। আজ যদি তাঁরা হিংসার পথ ত্যাগ করেন, এই পথে আসেন তা হলে আমাদের কত কাজে জোর হয়, আমাদের বল দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

এই সময়ে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, আমি গিয়া টেলিফোন ধরিলাম—সাংঘাতিক খবর! নায়ক আফিস হইতে টেলিফোন করিয়াছে—আজ সন্ধ্যায় তারকেশ্বরে গুলি চলিয়াছে। আমি চীৎকার করিয়া সেই খবর বলিলাম, তিনি ও শরৎবাবু ত্রস্তে বাহিরে আসিলেন! আমাকে বলিলেন, অত উত্তেজিত হয়ো না—টেলিফোনে সব কথা আগে ভাল করে জান। আমি ফোনে ভাল শুনতে পাইনে তুমি স্থির হয়ে ফোন কর।

আবার ফোন করিলাম, সেই একই জবাব, বিস্তারিত কিছু বলিতে পারিল না। তাহা শুনিরা তাঁহার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দিল, অস্থির ভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ (আজ তিনি অন্তরীণে আবদ্ধ) দুইজন কংগ্রেসকর্ম্মীসহ আসিলেন। তাঁহারাও ঐ খবরই দিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মুখে সব শুনিয়া তিনি খুব বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, নিরীহ ছেলেরা গুলি খেল, ধর্ম্মের স্থানে রক্ত-পাত হ'ল আর বাকী কি?

রাত তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে, আমরা তাঁহাকে সে দিনকার মত বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন, এত বড় সত্যাগ্রহ আমার ঘাড়ে, আমরা হেরে গেলে, বাঙলার মুখ থাকবে না। তার উপর এই সংবাদ, আমার বিশ্রাম কোথায়?

রাত একটা পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া তিনি যাহা যাহা করিতে হইবে তাহা বলিয়া আমাদের বিদায় দিলেন। শরৎবাবুও তাঁহার সঙ্গেই আছেন, তিনিও তখন বিদায় লইলেন। তাঁহাকে বিদায় দিতে সিঁড়ি পর্য্যন্ত নামিলেন, সিঁড়ির পার্শ্বে একটি অতিশয় মনোহর কাল পাথরের শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি ছিল। শরৎ-বাবুকে ঐ মূর্ত্তি সংগ্রহের ইতিহাস বলিতে লাগিলেন। ঐ মূর্ত্তিটি উড়িষ্যা হইতে তিনি সংগ্রহ করেন, বলিলেন, মূর্ত্তিটির বয়স পাঁচশত বৎসরের কম নহে। তাঁহার ইচ্ছা একটি মন্দির তৈয়ারী করিয়া এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

শরৎবাবুকে বলিলেন, আরো এক জোড়া রাধা-কৃষ্ণ মূর্ত্তি আছে, আপনাকে দিচ্ছি।

এই বলিয়া আবার উপরে উঠিয়া রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি শরৎ-বাবুকে দিয়া বলিলেন,—আজ জন্মাষ্টমী, তাতে তারকেশ্বরে গুলি চলেছে, ঠাকুর স্বয়ং আজ আপনার ঘরে যাচ্ছেন। নন্দের বাড়ি ছেড়ে আজ গোকুলে যাচ্ছেন। হাসিয়া বলিলেন,

"তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।"

কলিকাতা

কলিকাতার ঘটনা অনেক। সব কথা বলা চলে না। মোটা-মুটি যাহা মনে আছে তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব। তিনি কত বড় কবি ছিলেন, কত বড় ব্যারিষ্টার ছিলেন, কত বড় রাজনৈতিক ছিলেন—সে সব কথা আমাপেক্ষা অনেক যোগ্যতর লোক বলিবেন। ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়া তাঁহার মহান্ হৃদয়ের যে পরিচয় পাইয়াছি তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু বলিতে গিয়াই চোখ ঝাপ্সা হইয়া আসে, কলম চলে না! এত বড় মরমী আর কেহ ছিল না। লোকের দুঃখ কষ্ট নিজের প্রাণ দিয়া অনুভব করিতেন। অন্যের অভাবের কথা শুনিলে যেমন করিয়াই হোক তাহা মোচন

করিতেন। প্রার্থী কখনও বিমুখ হইত না। আমাদের সাক্ষাতেই কত লোক মিথ্যা বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকা লইয়া যাইত। টাকা দেওয়ার পর বলিতেন,—অমুকে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেল, ভেবেছে যে আমায় ঠকিয়েছে—তা নয়, আমি সব বুঝি।

কিন্তু এই বুঝ্ টাকা দেওয়ার আগে আসিত না। এই শহরের একখানা বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক পত্র তাঁহাকে কিছুদিন খুব গালাগালি দিত। অথচ প্রেস-আইনের জন্য জামিন বাজেয়াপ্ত হইয়া কাগজখানি যখন উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন তিনি নিজে দশহাজার টাকা জামিন হইয়া কাগজখানাকে বাঁচান। পরে আমরা এই কাগজের গালাগালি সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কাগজখানির বিরুদ্ধে লেখার কথা বলিতাম। তিনি হাসিয়া বলিতেন,—তোমরা থাম্‌কা উত্তেজিত হও কেন? পরের ভাল করলে গালি খেতে হয়, এ ত জানা কথা।

অথচ একদিনও সেই কাগজের বিরুদ্ধে একটি রূঢ় কথা বলিতে শুনি নাই।

তখন তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ পূরাদমে চলিতেছে। সত্যাগ্রহ উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার "নারায়ণ" যুগের কোন অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক বন্ধু একটি ঘটনা করিয়া বসেন। ঐ বন্ধুটির পানদোষ ছিল এবং উহা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। বন্ধুটি প্রকৃতিস্থ হইলে ভম্বলকে দিয়া

তাহাকে বলিয়া পাঠান,—ওকে বলিস যে, আমি তার জন্যে কেঁদেছি।

এই কথা শুনিবার পর ঐ বন্ধুটি আর মদ্য স্পর্শ করেন নাই!

তাঁহার অসহযোগ সময়ের জনৈক পুত্রপ্রতিম সহযোগী সম্বন্ধে কাগজে কলমে অনেক বিরুদ্ধ কথা রটে এবং অনেক সময় তাহারই কথা আলোচনা হইত। অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিতেন, তিনি কোন কথা বলিতেন না, চুপ করিয়া শুনিতেন। যখন নিন্দা অসহ্য হইত তখন তাহার জন্য চোখের জল ফেলিতেন!

"ফর্‌ওয়ার্ড" পত্রের নাটক ও বায়স্কোপ শীর্ষক স্তম্ভের প্রবন্ধ লেখক একদিন অযথা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে "ফর্‌ওয়ার্ড" কাগজে তাঁহাদের লেখা অশ্লীলতা—দোষে দুষ্ট বলিয়া তীব্রভাবে লেখেন, আমি ঐ প্রবন্ধের জবাব লিখিয়া দাশ মহাশয়কে দেখাইতে যাই। তিনি বলিলেন, এক পক্ষের লেখা যখন ছেপেছে, তখন তোমার প্রতিবাদও ছাপা উচিত। সে ব্যবস্থা আমি করব। তবে তোমাদের বিবাদ কি নিয়ে?

আমি বলিলাম, প্রবন্ধ লেখকের কথা এই, ইহা বস্তুতন্ত্রবাদী (Realistic) সাহিত্যিক, এ সাহিত্য সমাজের কলঙ্ক। আদর্শবাদী (Idealistic) বা didactic না হইলে সে সাহিত্যের কোন সার্থকতা নাই, ইহা লইয়াই যত বিবাদ।

তিনি বলিলেন,— তোমাদের এ বিবাদ আমি দু'ঘণ্টায় মিটিয়ে দিতে পারি। তোমরা অনর্থক একটা কাল্পনিক গণ্ডী সৃষ্টি ক'রে বিবাদ জটিল করে তুলেছ। বাস্তবিক পক্ষে সাহিত্যে realistic অথবা idealistic ব'লে কোন কথা নেই। রস-সৃষ্টি, দুঃখানুভূতি ও ত্যাগই হচ্ছে মূল কথা। যে সাহিত্যে তা আছে, তাই সৎসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বা নরেশ বাবুর লেখায় তা আছে—তাকে অশ্লীল বা কুৎসিৎ সাহিত্য বলা চলে না।

আমি বলিলাম, পতিতা নারীদের কথা ইঁহারা লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 'পুরীর চিঠিতে' স্বামীর সহিত মতের মিল না হওয়ায় স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। শরৎবাবু বেশ্যা-চরিত্রে নারীত্বের মহিমা দেখাইয়াছেন, নরেশ বাবু ভ্রষ্টা স্ত্রী গোপাকে ঘরে লওয়াইয়াছেন। ইহাতে এই সব ভূয়ো আদর্শবাদীরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে।

তিনি বলিলেন,—তোমার সাবিত্রীই হোক, বিমলাই হোক আর গোপাই হোক, তারা যদি প্রেমাস্পদের জন্য দুঃখ পেয়ে থাকে, ত্যাগ ক'রে থাকে, তাহলে তাদের সৃষ্টি সার্থক হয়েছে।

পরে বলিলেন,— আজকাল "ইব্‌সেনিজম" নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে দেখছি। এ দেশে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ স্বামী-স্ত্রীতে দাঁড়ালে তা অচ্ছেদ্য হয়, এটা অনেক সময় পীড়াদায়ক স্বীকার

করি; কিন্তু এ আদর্শ ভেঙে ফেলবার আগে তোমরা যা খাড়া করতে চাচ্ছ, তা টিকবে কিনা ভেবে দেখেছ কি ?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন,—Doll's House খুব জোরের লেখা। আমরা প্রতিদিন দেখতে পাই, স্বামী-স্ত্রীতে মিল নেই, পরস্পরের মধ্যে প্রেম নেই, অথচ তারা ঘরকন্না করছে, একসঙ্গে বসবাস করছে। যদি সকলের বাড়ীই Doll's House হয় তাহলে আমাদের—স্বামী বেচারাদের—কি দশা হয়, সেটাও ত ভাববার বিষয় !

এই বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। পরে আবার বলিলেন,—ইউরোপের আদর্শ তোমাদের মাথায় গিজগিজ করছে। তোমাদের ঘরের কোণে বৈষ্ণব-কবিদের যে অফুরন্ত প্রেমের আদর্শ আছে—সে সব ত তোমাদের নজরে পড়ে না। তাতে ইবসেন, ম্যাতারলিঙ্ক, জোলা, ন্যুট হামসুন—সব আছে। তোমাদের ইউরোপের কোন্ লেখক চণ্ডীদাসের মত সুদীর্ঘ বার বছর তার প্রণয়িণীর জন্যে একই জায়গায় রোজ ছিপ্ ফেলে বসে থাকত ? তাঁদের কেউ কি বল্‌তে পেরেছে—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে পর হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ল না গেল।"

রূপ বর্ণনাই কি বৈষ্ণব-কবিদের সমান কেউ করতে পেরেছে ? বলিয়া বলিলেন—

"চলে নীল শাড়ি নিঙারি নিঙারি
পরাণ সহিত মোর।"

বৈষ্ণব-কবিদের অভিসার, মিলন, বিরহ, যা আছে, তোমার শত ইবসেন বা ইউরোপের সব লেখক একত্র হলেও তা বলতে পারবে না।

এই সময় আরও তিন চার জন লোক আসিয়া পড়িল, কাজেই তখনকার মত সাহিত্য আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল।

আমি যখন চলিয়া আসি তখন বলিলেন,—এ সব লেখালেখি বন্ধ ক'রে দিতে আমি—কে ("ফর্ওয়ার্ড" পত্রের নাটক ও বায়স্কোপ শীর্ষক স্তম্ভের প্রবন্ধলেখক) ব'লে দেব।

আর এক দিনের ঘটনা। তখন উত্তর বঙ্গে দুর্বৃত্তদের হাতে হিন্দু নারীর লাঞ্ছনার সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। আমরা খুব উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ঐ সব ধর্ষিতা নারীর নিজ নিজ ঘরে আশ্রয় না পাইলে তাহাদের জন্য অবলা আশ্রম গোছের খুলিবেন।

উত্তর বঙ্গের কোন জেলা হইতে ঐরূপ তিনটি ধর্ষিতা নারী নিরাশ্রয় হইয়া কলিকাতা আসিয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায় তাহা জানিবার জন্য তাঁহার কাছে গিয়াছি।

গিয়া দেখিলাম, তিনি মোটরে উঠিয়াছেন, তখনই তারকেশ্বর যাইবেন। আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার কোন কথা আছে? আমি 'হাঁ' বলায় আমাকে মোটরে উঠিতে বলিলেন,—সঙ্গে এসো। সঙ্গে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকুমার রায় আছেন।

গাড়ী রসা রোডে পড়িতেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি কথা?

আমি বলিলাম, তিনটি ধর্ষিতা নারী আসিয়াছে, তাহাদের কোথায় আশ্রয় দেওয়া যায়? তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন, কেন, তাদের বাড়ীতে নিতে চায় না?

আমি বলিলাম, না।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি জাত?

একটি ব্রাহ্মণ, আর দুটি নমঃশূদ্র।

—ব্রাহ্মণ মেয়েটির আশ্রয় হতে পারে। তবে নমঃশূদ্র মেয়ে দুটির আশ্রয় কোন আশ্রমে হবে না। এ নিয়ে আমি খুব চেষ্টা করেছি কিন্তু কোন আশ্রমই রাজী হয় না।

এই বলিয়া তিনি আবার বলিলেন,—পায়রার খোপের মত আমি কত বিভাগ করব? এখানে ব্রাহ্মণের, ওখানে নমঃশূদ্রের। আবার যারা অন্য জাতির, গুণ্ডার দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছে তাদেরও আবার এরা কেউ নিতে চায় না। আশ্রম খুলে এদের আশ্রয় দেওয়া

যাবে না। কিন্তু তাদেরও ত রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যাদের উপর অত্যাচার হবে তাদের যাতে ঘরে নেয় সে ব্যবস্থাই আগে দেখতে হবে। ঘরে আশ্রয় না পেলে, ওসব হতভাগিনীদের জন্য কিছু কিছু বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

এই বলিয়া সত্যসত্যই তিনি চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। বলিলেন,—এই দেশের অবস্থা !

আমি নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে মোটর হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিল কথা ঐ খানেই বন্ধ হইল।

এবার স্বরাজ্য কন্‌ফারেন্সের একটি কথার বিষয় বলিব। অল-ইণ্ডিয়ার স্বরাজ্য কন্‌ফারেন্স। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নেতারা আসিয়াছেন, বাগবাজারে পশুপতি বসু মহাশয়ের বাড়ীতে কন্‌ফারেন্স।

তখন গভর্ণরের ঢাকার উক্তি লইয়া দেশে মহাউত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। এ বিষয়ের প্রতিবাদ করিতে উঠিয়া অনেকে অনেক বলিলেন। শেষে তাঁহার অনুমতি লইয়া আমি মাত্র একটি কথা বলি। তিনি রিপোর্টারদের ডাকিয়া বলিয়া দিলেন,—শৈলেশের এ কথা তোমরা প্রকাশ করো না। পরে আমাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন,—তোমাকে সামলানো দায় হয়েছে, বক্তৃতা করে জেলে যাওয়ার পক্ষে আমি নই, পার ত কাজ করে জেলে যাও।

স্বরাজ্য কন্‌ফারেন্সের পর সেপ্টেম্বরে তিনি দিল্লী চলিয়া গেলেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সময় জমিদার পক্ষ সমর্থন করিয়া একজন পত্র-প্রেরক 'ইংলিশম্যান," "ফর্‌ওয়ার্ড," "অমৃতবাজার" প্রভৃতি পত্রে স্বরাজ্যদলকে আক্রমণ করেন এবং এই বলিয়া কটাক্ষ করেন যে, স্বরাজ্যদল দাশ-নেহেরুর ঘোষণা উপেক্ষা করিয়া বোলশেভিকদের পথে আগাইয়া চলিয়াছে। আমি কাগজে প্রতিবাদ করি। পরে তিনি ফিরিয়া আসিলে ঐ লেখকের প্রকাশিত প্রবন্ধ ও আমার জবাব তাঁহাকে দেখাই। তিনি বলিলেন,—আমরা আগে offensive নেব না, জমিদারদের শুধরাবার অবসর দেব। সেজন্য আমি কাউন্সিলে একটি কমিটি করেছি, বাইরেও "অল-বেঙ্গল টেনেণ্ট্‌স্ প্রোটেক্‌সন্ লীগ" নাম দিয়ে একটি কমিটি গঠন করব। এ কমিটি বাঙলা দেশ ঘুরে জেলায় জেলায় গিয়ে কোন্ জমিদার কেমন, তার খোঁজ নিয়ে রিপোর্ট দিক্। যে জমিদার অত্যাচারী, আমরা তাকে সাবধান হতে বলব। যদি না শোনে, তখন আপনার ভারে আপনা থেকেই তারা ভেঙে পড়বে। সে জন্য আগে থেকেই আমাদের offensive নেওয়ার কাজ কি? জমিদারদের পেছনে "ট্রেডিশন" বলে কিছু আছে—তারা যদি তাদের অতীতের আদর্শে ফিরে না যায় তাহলে কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না। তিনি All Bengal Tennants Protection Committee বলিয়া একটা কমিটিও গঠন করিয়াছিলেন। "অর্ডিনান্স"

আইনের গোলযোগটাকে রীতিমত কাজে লাগাইতে পারেন নাই।

পূজার পরই বাঙলায় "অর্ডিন্যান্স"-এর বজ্রপাত হইল— একাত্তর জন বাছা বাছা কংগ্রেসকর্ম্মী বিনাবিচারে কারারুদ্ধ হইলেন। সে দিনের ঘটনা আমার এখনও চোখের সামনে ভাসিতেছে। বড়-বাজারে কালীপূজায় গোলমাল হইবে রটাইয়া দিয়া পুলিশ অধিকাংশ লোকের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করে। আমরাও সেদিন এগারটা পর্য্যন্ত বড়বাজারে শান্তিরক্ষক স্বেচ্ছাসেবক গঠনে ব্যস্ত ছিলাম। বাসায় ফিরিতেই পথে এই নিদারুণ সংবাদ শুনিলাম। শুনিয়া বজ্রাহতের মত বসিয়া পড়িলাম! প্রথম আঘাতের চোট সামলাইয়া আমরা ৯ নং রসারোড কংগ্রেস আফিসে গেলাম। সেখানে পুলিশ বেলা দুইটা পর্য্যন্ত আমাদের প্রবেশ করিতে দিল না। পরে তাহারা চলিয়া গেলে কংগ্রেস আফিসে ঢুকিয়া যাহারা তখন সেখানে উপস্থিত ছিল তাহাদের সঙ্গে প্রাণভরা আলিঙ্গণে পরস্পর আবদ্ধ হইলাম। সকলের মুখেই বিষাদ ও নিরুৎসাহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাণপ্রিয় সহকর্ম্মীদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এ সময় দেশবন্ধু উপস্থিত নাই, তিনি উপস্থিত থাকিলে একটা ব্যবস্থা হইতই। তাঁহার নিকট নানা দিক হইতে তার প্রেরণ করা হইল। তিন দিন পর তিনি কলিকাতা পৌঁছিলেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া তিনি সিমলায় কুতুবের কাছে এক তাঁবুতে

ছিলেন। আমরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য এতই উৎসুক হইয়াছিলাম যে হাবড়া ছাড়িয়া লিলুয়ায় গেলাম। মেল গাড়ি প্লাটফরমে ঢুকিতেই আমরা লাফাইয়া তাঁহার গাড়িতে উঠিলাম। কুশল প্রশ্ন আর করা হইল না—প্রথম কথাই "অর্ডিন্যান্স" লইয়া।

আমরা বলিলাম, এ দিকে গুজব, আপনাকে পথে ধরিবে। দিন দুই আরো অপেক্ষা করিয়া আসিলে হইত না কি ?

তিনি বলিলেন,—আমার ঘরে আগুন লেগেছে, আমার কি পালিয়ে থাকা চলে ? তারা যেখানে ইচ্ছে হয় ধরুক, তাতে ভ্রূক্ষেপ করব না। এর একটা কিছু বিহিত করবই।

তাঁহার উপস্থিতিতে আমাদের প্রাণে বল ফিরিয়া আসিল, নিরুৎসাহের ঘোর কাটিয়া গেল। তিনি আসিয়াই পরের দিন কর্পোরেশনে বজ্র নির্ঘোষে Lawless Law বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে যে challenge করিলেন, সে কথা সকলেই জানেন। পরে তাঁহার সমস্ত শক্তি এই"অর্ডিন্যান্স"-এর অন্যায়ের প্রতিবাদ কল্পে,"ডায়ার্কি" ভাঙ্গিবার জন্য কাউন্সিলে প্রবেশ করিলেন। তিন তিনবার কাউন্সিল জয় করিতে তাঁহার অর্দ্ধেক পরমায়ু ক্ষয় হইয়াছিল। বাকী যেটুকু ছিল তাহা স্বরাজ্য সপ্তাহেই শেষ করিয়াছিলেন।

স্বরাজ্য সপ্তাহের কথা মনে পড়ে। অনাহারে অস্নাত অবস্থায় বেলা দুইটা পর্য্যন্ত ঘুরিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়াই আধঘণ্টার মধ্যেই স্নানাহার শেষ করিয়া আবার বাহির হইয়াছেন। যে

লোকের চাকরে তেল না মাখাইলে স্নান হইত না, বহুবিধ ভোজ্যেও যাঁহার তৃপ্তি হইত না, তিনি কোন রকমে ছুটি নাকেমুখে গুজিয়া খাওয়া সারিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

দিল্লী হইতে ফিরিয়া দ্বিতীয়বার যখন তাঁহার শূলবেদনা হয়, তিনি তাঁহার পূর্ব্বদিন ছোলার ডাল খাইয়াছিলেন। তাহা হইতেই বেদনা বৃদ্ধি। ছোলার ডাল তাঁহার পক্ষে কুপথ্য ডাক্তারেরা খাইতে নিষেধ করিয়া ছিল। উপরের হলঘরে সকলে সমবেত হইয়া তাঁহাকে তখন তাঁহার খাওয়া সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিল; তিনি হাসিয়া বলিলেন,—আর বিশেষ কিছু ছিল না, ভাতগুলি ওঠাতে হবে ত, তাই ছোলার ডাল দিয়ে সে কাজটি সেরে ফেলেছি।

চিরজীবন জটা কমণ্ডলুধারী অনেক সন্ন্যাসীর কথা শোনা যায়, কিন্তু রাজর্ষি জনকের মত ভোগ ও ত্যাগের এই অপূর্ব্ব সমন্বয় আজকালকার দিনে কেহ দেখিয়াছে কি না জানি না।

পাটনা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার বড় জামাতা শ্রীযুক্ত সুধীর রায়ের বাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহার নিজ আবাস ভবন তখন দান করিয়া দিয়াছেন, সেই কারণে সে-বাড়ীতে আর উঠেন নাই, সুধীরবাবুর বাড়ী হইতেই তৃতীয়বার মন্ত্রী-বেতন-প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টকে হারাইয়া দেন। পরে ২ নং বিশপ লিফ্রয় রোডে বাড়ী ভাড়া করেন।

তখন শরীর খুব অসুস্থ, হাত কাঁপে, চলিতে পারেন না।

পাট্‌না হইতে ফিরিবার আগেই তাঁহার ১৪৮ নং রসা রোড ভবনে চুরী হইয়া যায়, রূপার বাসন-পত্র সবই চোরে লইয়া যায়।

তিনি জেল-ফেরত একটা দাগী চোরকে লইয়া আসেন ও তাহাকে চাকর করিয়া বাড়ীতে আশ্রয় দেন। যে ভাবে চুরী হইয়াছে, তাহাতে বাড়ীর লোকের যোগাযোগ না থাকিলে বাহির হইতে লোক আসিয়া চুরী করিতে পারে না। পাটনা যাইবার সময় চোর-চাকরকে বাড়ীর হেপাজত করিবার জন্য রাখিয়া যান। চুরীর পরে সকলেই ঐ চোর-চাকরকে জেলে দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। সকলেই বলিল, ও দাগী চোর, ওর সহযোগেই চুরী হইয়াছে।

অনুমান যে অনেকটা সত্য, সে কথা তিনিও স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাহাকে জেলে দিলেন না। আমরা ঐ চাকরকে জেলে দিতে বলায় তিনি বলিয়াছিলেন,—ওকে জেলে দিলে আর কি হবে? আমি ওকে ধমকে ছিলাম, ব্যাটা কেঁদে বলল, জেলে গেলে সে দুটো খেতে পাবে বটে কিন্তু তার স্ত্রী-পুত্র না খেতে পেয়ে মারা যাবে। কি কাজ একটা সংসারকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলে?

দার্জিলিঙ যাইবার অব্যবহিত আগে তিনি "ফর্‌ওয়ার্ড" পত্রের জনৈক কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করেন। পাঁচ সাতদিন পর ঐ কর্ম্মচারীটি তাঁহার কাছে আসিয়া হাজির। সে খাইতে না পাইয়া

মারা যাইতেছে। অমনি সব রাগ জল হইয়া গেল! সে যে খাইতে পাইতেছে না, এ কথা আগে সে বলে নাই কেন এই বলিয়া তাহাকে ভৎ´সনা করিলেন। পরে তাহাকে কাজে পুনরায় বাহাল করিয়া তাহার খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন!

কেহ খাইতে পাইতেছে না এ কথা শুনিলে তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন না। যেমন করিয়াই হোক, তাহার অন্নসংস্থান করিয়া দিতেন।

বেলগাঁও

"অর্ডিন্যান্স" আইনের প্রতিবাদ কল্পে মহাত্মাজী ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের নেতারা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সেই সময় informal conference-এ ইহা লইয়া বিতর্ক হয় যে, স্বরাজ্যদলকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া হইবে কিনা। তখন এই বিতর্কের মীমাংসা হইল না। এই রকম একটা বিতণ্ডার ভাব লইয়াই বাঙলা দেশ হইতে আমরা সেবারে কংগ্রেসে যোগদান করিতে যাই। দাশ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, স্বরাজ্যদলকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মানিয়া না লইলে তিনি স্বরাজ্যদলকে কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র

করিয়া লইবেন। তিনি কংগ্রেসের সদস্যদের চারি আনা চাঁদার পরিবর্ত্তে সূতা কাটার প্রস্তাব মানিয়া লইলেন, কাজেই মহাত্মাজীও স্বরাজ্যদলকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন। পরে এই দুইটি প্রস্তাব কংগ্রেসে উত্থাপন করিলে সূতাকাটা-চাঁদার বিরুদ্ধে পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের নেতারা ঘোরতর আপত্তি করেন। দাশ মহাশয় তাঁহার অসাধারণ বাক্‌পটুতার দ্বারা সমস্ত বিরুদ্ধ যুক্তি-তর্ক খণ্ডন করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহাত্মা গান্ধীর ঐ প্রস্তাব পাশ করাইয়া লন। স্বরাজ্যদল কংগ্রেসেরই অন্তর্ভুক্ত, এই প্রস্তাবটিও মানিয়া লইতে কেহই আপত্তি করে নাই। এই দুইটি বিষয় ছাড়া এবারকার কংগ্রেসে আর কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল না।

এই কংগ্রেস উপলক্ষ্যে তাঁহার অপূর্ব্ব ধৈর্য্য ও অনন্যসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। তিনি সকাল আটটার সময় বেলগাঁও-এ পৌছেন, অপরাহ্ন দুইটা পর্য্যন্ত নিখিল-ভারত রাষ্ট্র-সভার বৈঠক চলিতেছে। তাঁহার মুখখানি শুক্‌নো দেখিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার এখনো খাওয়া হয় নাই?

তিনি হাসিয়া বলিলেন,—আজ খাওয়ার কোন বন্দোবস্ত ছিল না, তাই কুকার-এ রান্না চাপিয়ে এসেছি। গিয়ে খাব।

সেদিন বেলা চারিটার সময় সভার কার্য্য শেষ করিয়া গিয়ে আহার করেন। অথচ আমরা বেলা বারটার সময় পৌছিয়াই স্নান আহার শেষ করিয়া তবে বৈঠকে যোগদান করি।

বেলগাঁও-এ তাঁহার খাওয়ার খুব অসুবিধা হইয়াছিল। টিনের খাদ্য খাইয়া এখান হইতেই তাঁহার কাল ব্যাধির সূত্র-পাত হইল।

কংগ্রেস ত হইয়া গেল। এবার ফিরিবার পালা। আমরা এক সঙ্গেই রওনা হইলাম। পরদিন ভোর বেলা পুনা ষ্টেশনে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম। দেখিলাম সবেমাত্র উঠিয়া তিনি আর মতিলালজী চা পান করিতেছেন। আমি গিয়া বলিলাম,—আমরা আজ পুনায় থাকিতে চাই। আপনি বোম্বে গিয়া দুদিন বিশ্রাম না করিয়া কখনই কলিকাতায় যাইবেন না। কারণ এ কয়দিনের অনিয়মে আপনার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে।

তিনি স্বাভাবিক হাসি হাসিয়া বলিলেন,—তোমরা সব দেখে শুনে এসো। কিন্তু আমার যে বিশ্রামের সময় নেই—সাত দিন পর আমার কাউন্সিল। আমি আজই বোম্বে মেল ধরে কলকাতায় চলে যাব।

করিয়াছিলেনও তাই। বেলা দশটায় বোম্বে পৌছিয়া ঐ দিনই বিকালের ডাক-গাড়ীতে তিনি কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

কলিকাতা আসিয়াই তিনি অম্লশূলে শয্যাগত হইয়া পড়েন কিন্তু প্রাণে যাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম তিনি ত আর সাধারণের মত রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকিতে পারেন না। তাই ষ্ট্রেচারে শুইয়াই তিনি কাউন্সিলে উপস্থিত হইলেন এবং তৃতীয়বার গবর্ণমেণ্টকে মন্ত্রী-বেতন প্রস্তাবে হারাইয়া দেন।

দেশ-মাতৃকার আহ্বানে নিজের দৈহিক অসুস্থতাকেও তিনি কোন দিন এতটুকু বিশ্রামের অবসর দেন নাই।

শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে শবদেহ বহন করিয়া আনা হইতেছে

BAN PRESS, CALCUTTA
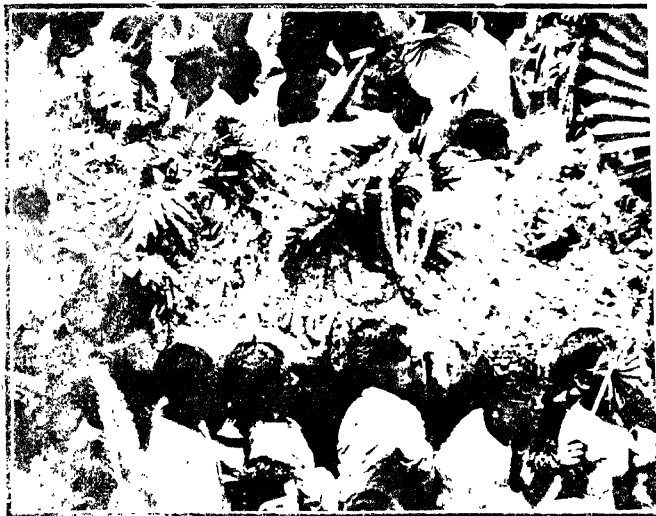
পাটনা

বেলগাঁও হইতে যে ব্যাধি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বসিল, তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইতে অনেক দিন লাগিল। এই সময় ডাক্তারদের পরামর্শে বায়ুপরিবর্ত্তন ও বিশ্রামের জন্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পাট্‌নার বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয়ের কাছে পাটনা যাওয়া স্থির হইল। সে সময় তিনি আমাকে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিবার ভার দিয়াছিলেন। তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও তিনি আমাকে প্রায় প্রতি দিনই ডাকাইয়া কাগজ বাহির করার সম্বন্ধে declaration লওয়ার কি হইল, তাহার কি নাম ঠিক করিয়াছি, তাহার ব্লক কিরূপ হইল ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

জিজ্ঞাসা করিতেন। এবং যে-দিন পাটনা চলিয়া গেলেন সে-দিন বিকালে দেখা করিতে গেলে তিনি আমাকে বলিলেন,—আমি ত চল্লুম, ইতিমধ্যে তুমি কাগজখানা বার ক'রে আমায় সেখানে পাঠিয়ে দেবে। আর দেরী করা নয়, শীগগির যাতে বার করতে পার তার ব্যবস্থা করে ফেল।

ইহারই কয়েক দিন বাদে কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমি পাটনা যাই। পাটনাতে যাইয়া আমি ডাক-বাঙলাতে উঠি। পৌঁছিয়াই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আলি মঞ্জিল-এ উপস্থিত হই। গিয়া দেখিলাম দুই ভাই পরম উৎসাহে কীর্ত্তন শুনিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—এখন ত কীর্ত্তন হচ্ছে, তুমি একটু ঘুরে এসো।

এগারটার সময় পুনরায় গেলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কখন এলে? কোথায় উঠেছ?

আমি সকালে পৌঁছিয়া ডাকবাংলাতে উঠিয়াছি বলায় তিনি ভারি দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পরে বলিলেন, ভারী ক্লান্ত হয়েছি। বিকালে এসো তখন কথাবার্ত্তা হবে।

বিকালে আমি যথাসময়ে তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলাম। তখনও তাঁহার শরীর অসুস্থ, হাত কাঁপে, ভারী দুর্ব্বল, চলিতে পা কাঁপে। কাজের কথা পাড়িতে আমাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—রোগ ত আমার এখন চিরসাথী, তার জন্যে

কাজ ত আট্‌কা রাখলে চলবে না। যতক্ষণ বেঁচে আছি, কাজ করতেই হবে।

এই বলিয়া আমাকে কাজের বিষয়ে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া তাড়াতাড়ি বিদায় দিলেন। কেননা ঐ দিনই রাত্রিতে আবার স্বরাজ্যদলের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন সম্পাদন করিতে হইবে। দৈহিক পীড়া তাঁহার কর্ম্ম-নিষ্ঠাকে কিছুতেই পরাজিত করিতে পারে নাই।

ফরিদপুর

ফরিদপুর কনফারেন্স এক-হিসাবে যুগ-প্রবর্ত্তক (Epoch-making) ইহা লইয়া চারিদিকে খুব হৈ-চৈ গণ্ডগোল হইতেছে। কেহ বলেন, দাশ মহাশয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগ করিতে চাহিয়াছেন ; কেহ বা বলেন, এই কনফারেন্স তাঁহার পরাজয়ের নিদর্শন ; আর কেহ বা বলেন, ইহা তাঁহার বিজয় দুন্দুভি। আমি তর্ক-বিতর্ক ছাড়িয়া দিয়া এই কনফারেন্স উপলক্ষ্যে ভিতরের মানুষটির যে পরিচয় পাইয়াছি তাহাই বলিব।

তিনি পাটনা থাকিতেই বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির সভায় তাঁহাকে এক বাক্যে ফরিদপুর কনফারেন্সের সভাপতিপদে

বরণ করা হয়। প্রথম তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। তাঁহার অসুস্থতার জন্য দুইবার অধিবেশনের তারিখ বদলাইতে হয়।

কনফারেন্সের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা আসেন। বাহির হইতে দেখিতে খুব রোগা দেখাইত না, কিন্তু জামা খুলিলেই তাঁহার কঙ্কালসার চেহারা নজরে পড়িত। কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে তিনি জামা খুলিয়া দেখাইলেন। আমরা তাঁহার দেহের অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সেই সভাতেই কনফারেন্সে যে সকল প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবে, তাহার একটা খসড়া তিনি উপস্থিত করেন এবং এই সময়েই তাঁহার ফরিদপুর-অভিভাষণ আমরা দেখিতে পাই। অভিভাষণ লইয়া কোন আলোচনা করাই হয় না, তবে প্রস্তাবের খস্‌ড়া লইয়া একটু আলোচনা হয়। কমিটির বেশীর ভাগ সদস্যের মতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইবে না তাহা তিনি বাদ দিবেন এই কথা বলার পর সে-দিনকার কমিটির অধিবেশন ভঙ্গ হয়।

এইবার ফরিদপুর যাত্রার কথা। এক ট্রেণেই আমরা তাঁহার সঙ্গে ফরিদপুর রওনা হইলাম। তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া পথে কোন রকম হৈ-চৈ না হয় সে সম্বন্ধে নিষেধ ছিল। শেষ রাত্রিতে আমরা রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, তখনও রাত্রি আছে। সেখানে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস তাঁহার দলবল লইয়া উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু দাশ মহাশয়ের

ঘুমের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া নীরবেই চা-বিস্কুট দিয়া আমাদের অভ্যর্থনার কাজ শেষ করিলেন।

যথা সময়ে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। বেলা আটটার সময় ফরিদপুর পোঁছিলাম। মাঝের ষ্টেশনে খবর পাওয়া গেল, দাশ মহাশয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। আমরা উঁকি মারিয়া দেখিলাম, তিনি বেঞ্চির উপর বসিয়া গল্প করিতেছেন। তিনি সুস্থ আছেন, রাত্রিতে সুনিদ্রা হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলাম।

ফরিদপুর নামিবার পরও যাহাতে বেশী গোলমাল না হয় সে ব্যবস্থা ছিল। তিনি ট্রেণ হইতে নামিয়াই আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিহে, ট্রেনে ত তোমাদের কোন অসুবিধা হয় নি? ঘুমাতে পেরেছিলে ত? পরে সুরেন বাবুকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এদের থাকবার জায়গার সুবন্দোবস্ত হয়েছ ত? এই বলিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিলেন, আমরা সকলে তাঁহার অনুগমন করিলাম।

আমরা বৈকালে তাঁহার বাঙলায় যাইয়া দেখিলাম, সারা বাড়ীতে শহরের যত নারী-পুরুষ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! তিনি স্মিত হাস্যে সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিতেছেন! পরের দিন মহাত্মাজী আসিবেন, তাঁহার অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত ও কনফারেন্সে যে-সকল প্রস্তাব গৃহীত হইবে তাহারই আলোচনা চলিতে লাগিল।

ইহার পরেই ঠাকুর জগদ্বন্ধুর সমন্ধে কথা আরম্ভ হইল। অদূরেই ঠাকুরের আশ্রম। তিনি বলিলেন, ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার দুইবার দেখা হইয়াছিল। তিনি যে বাড়ীতে আছেন তাহারই উঠানে পঞ্চবটী আছে, সেখানে ঠাকুর আসিয়া বসিতেন, বলিলেন। জুতো পায়ে পঞ্চবটী তলায় যাইতে আমাদের নিষেধ করিলেন।

রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত নানা রকম কথা-বার্ত্তায় কাটাইয়া আমরা সে-দিনকার মত তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

পরদিন কনফারেন্স। সকালেই শুনিলাম মহাত্মাজী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শহরময় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দুটার সময় কনফারেন্স বসিবার কথা, আমরা একটার সময় যাইয়া মণ্ডপে উপস্থিত হইলাম। মণ্ডপ জনাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিলধারণের স্থান নাই। স্বয়ং দাশ মহাশয় সভাপতি, মহাত্মজী দর্শক, ফরিদপুরের সৌভাগ্যের সীমা নাই।

দাশ মহাশয় তিনটার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মহাত্মাজী তারই ঘণ্টাখানেক মধ্যে আসিলেন। বিপুল জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র নর-নারী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিল। সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পঠিত হইবার পর দাশ-মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে উঠিলেন। স্বাভাবিক সুললিত কণ্ঠে ওজস্বিনী ভাষায় তিনি তাঁহার অভি-

ভাষণটি পাঠ করিলেন, শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের মত ঘণ্টাদেড়েক সে অভিভাষণ শ্রবণ করিল। সে-দিনকার মত এইখানেই সভার কার্য্য শেষ হইল।

রাত্রি আটটার সময় "সাবজেক্ট কমিটির" অধিবেশন। পরদিনের অধিবেশনের জন্য প্রস্তাবের খসড়া উপস্থিত করা হইল। একটি প্রস্তাবে, পঁচিশে অক্টোবর বে-আইনী আইনের (অর্ডিন্যান্স) জুলুমে যে সকল কংগ্রেস-কর্ম্মীকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহাদের নির্দ্দোষী বলা হয়। কিন্তু পঁচিশে অক্টোবরের আগে ও পরে তিন আইন ও অর্ডিন্যান্সে যে সকল সহকর্ম্মীদের বন্দী করা হইয়াছে তাঁহাদের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে সে প্রস্তাবে কোন উল্লেখ ছিল না। কেবল পঁচিশে অক্টোবরের বন্দীদের নির্দ্দোষিতার কথাই বলা হইয়াছিল, ইহা লইয়াই মতভেদ উপস্থিত হয়।

এই মতভেদ শেষ পর্য্যন্ত মনান্তরে পৌছিবার উপক্রম হয়। কারণ তরুণের দল প্রস্তাবে তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় সহকর্ম্মীদের নির্দ্দোষিতার উল্লেখ না দেখিয়া ভারী মর্ম্মাহত হইলেন, অথচ লর্ড রেডিং ও লর্ড লিটন যাঁহাদের উচ্চকণ্ঠে দোষী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহারই জবাবে দেশবন্ধু কেবলমাত্র তাঁহাদের নির্দ্দোষিতাই প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অনেক বাগবিতণ্ডা হইল কিন্তু সে দিন রাত্রিতে আর সে সম্বন্ধ কোন মীমাংসাই হইল না। এই ঘটনাতেই তাঁহার অন্তরের অপ্রতিহত তেজস্বিতা
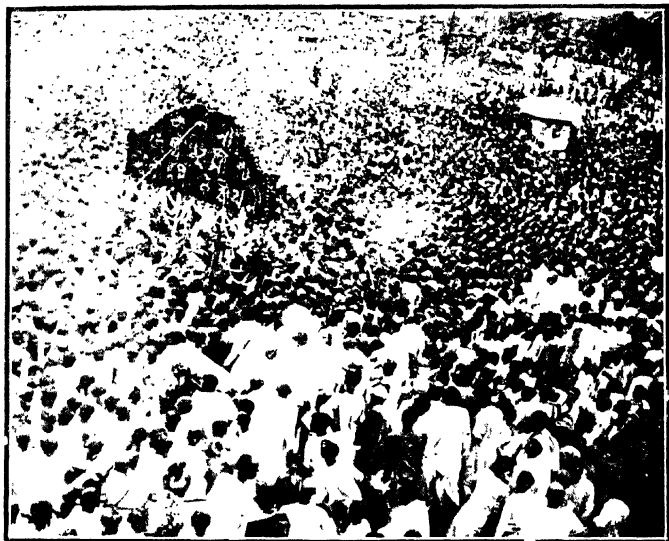
শিয়ালদহের বাহিরে পুষ্পতোরণ শোভিত শব-যাত্রায় শোকার্ত্ত
নরনারীর বিপুল-জনতা

BANI PRESS, CALCUTTA

সকলের সম্মুখে প্রজ্বলিত হুতাশনের মত জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণের কথাও তরুণের দল বুঝিতে পারিতেছিলেন না, আর তরুণ-দলের প্রাণের মর্ম্মন্তুদ বেদনাও তাঁহারা তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলেন না। সে-দিন ওইখানেই বৈঠকের কাজ স্থগিত রহিল।

পরদিন সকালে তরুণের দল তাঁহার নিকট যাইয়া নিজেদের মনের ব্যথা জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহার মনে কোন রকম আঘাত দেওয়ার ইচ্ছা তাঁহাদের কখনই ছিল না জানাইলেন। তাঁহার নেতৃত্বে তাঁহাদের অগাধ বিশ্বাস, কেবল নেতৃত্বে নয়, তাঁহাদের হৃদয়ের উপর তাঁহার অপরিসীম আধিপত্যের এতটুকুও হ্রাস হয় নাই। সব কথা শুনিবার পর অর্ডিন্যান্স ও তিন আইনের বন্দীদের নির্দ্দোষিতার প্রস্তাব একবাক্যে গৃহীত হয়। বাঙলার রাজনীতির আকাশে যে মেঘটুকু দেখা দিয়াছিল তরুণদের প্রাণের হিল্লোলে তাহা কাটিয়া গেল।

তাঁহার স্বাভাবিক স্মিতহাস্যে আবার সকলে অভিনন্দিত হইল তাঁহার মুখের হাসি দেখিয়া সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইল।

এই রকমে মহা আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে ফরিদপুর-অধিবেশন শেষ হয়!

এই অধিবেশনের রাজনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশী। কারণ তিনি গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগ করিতে চাহিয়াছেন, এই অপবাদ

তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা রটাইয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব তাঁহার সহিত দার্জিলেঙ-এ "শেষ সাক্ষাতে" ব্যক্ত করিয়াছি।

একই সঙ্গে আমরা তাঁহার সহিত ফরিদপুর হইতে রওনা হই। তিনি ফরিদপুর একদিন অসুস্থ হইয়া পড়েন। গাড়ীতে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হই। তিনি গাড়ীতে উৎফুল্ল ভাবে আমাদের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, একটু ভাল আছেন। কলিকাতা গিয়াই দার্জিলিঙ যাইবেন। সেখানে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিবেন। তাঁহাকে প্রফুল্ল দেখিয়া মনের আনন্দে গাড়ী ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমরা প্রণাম করিয়া বিদায় লই।

শেষ সাক্ষাৎ

জুন মাসের প্রথম দিকে আমি দার্জিলিঙ যাই। সে-দিন ডাক-গাড়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ের ঢের পরে যাইয়া দার্জিলিঙ পৌঁছিল। সে-দিন আর 'ষ্টেপ-এসাইডে' যাওয়া হইল না। পরের দিন পাঁচটার সময় দেশবন্ধুর কাছে যাই। যাইতেই পথে চৌরাস্তায় শ্রীমতী এনি বেসান্তের সাথে দেখা। তিনি দাশ মহাশয়ের বাড়ী খুঁজিতে-ছিলেন। একেবারে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই গিয়া হাজির হইলাম। দেশবন্ধু তখন বাহিরে বেড়াইতে যাইবার জন্যে রিক্সতে উঠিতে-ছিলেন, আর বাহিরে যাওয়া হইল না। আমাদের সঙ্গে লইয়া গিয়া বারান্দায় বসিলেন। বলিলেন, তুমিও বসো।

মিসেস বেসান্ত মৃদুস্বরে বলিলেন,—I have got something private. তাহা শুনিয়া দেশবন্ধু একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, কারণ যখনই অল-ইণ্ডিয়া লিডার বা বাহিরের কেহ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তিনি আমাদের বাদ দিতেন না, সামনে থাকিলে ডাকিয়া লইতেন।

—তাতে কি? এই বলিয়া আমি মিসেস বেসান্তের পার্শ্বচর শিবরাওকে সঙ্গে লইয়া পাশের ঘরে ঢুকিলাম।

মিসেস বেসান্তের সঙ্গে তাঁহার যে কথা হইল তাহা আমাদের শুনাইয়া শুনাইয়াই বলিতে লাগিলেন, আমাদের কোন কথাই অজ্ঞাত রহিল না। তিনি আসিয়াছেন, তাঁহার Common Wealth of India Bill সম্বন্ধে দেশবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করিতে ও তাঁহার মতামত জানিতে। এক ঘণ্টার উপর তাঁহাদের কথাবার্ত্তা চলিল। যখন মিসেস বেসান্ত উঠিলেন, আমায় ডাকিলেন। আমি ছড়ি এবং টুপি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলাম। বলিলেন,—চল, এখন বেরোন যাক।

রিক্স পিছনে পিছনে চলিল। তিনি মাঝখানে, আমি ও ভাস্কর (ছোট জামাই) দুই পার্শ্বে চলিলাম। "ষ্টেপ-এসাইড" হইতে লিবং রোড দিয়া ম্যেলে উঠিতে হয়। ঐ-টুকু পথ কেবল কুশলপ্রশ্ন ও আমাদের কে কেমন আছে তাহা খুঁটিনাটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। শরীর ভাল হইতেছে বলিলেন, চেহারায়ও বেশ লালিমা

ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিলাম—যেন পূর্ব্ব-শ্রী ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হইল। হাসি ঠাট্টা ও কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে আমরা "ম্যেলে' আসিয়া পৌঁছিলাম। নবাব নবাবআলি হইতে আরম্ভ করিয়া রাস্তার লোকজন, আর্দ্দালী, চাপরাসী, কুলিরা পর্য্যন্ত দুই ধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতে লাগিল। অসংখ্য পরিচিত অপরিচিত নর-নারীর স্মিত অভিবাদন ও কুশল প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। আমরা ম্যাকেঞ্জি রোড দিয়া সোজা চলিলাম। পথে প্রত্যেক পরিচিত ব্যক্তি ও দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া তাহাদের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

পথে ডান দিকে কতকগুলি লাল করগেটের ছাত-দেওয়া এক-প্যাটার্ণের বাড়ী দেখাইয়া আমাদের বলিলেন, এই গুলি একজন 'জার্ম্মেনের' ছিল গেল যুদ্ধের সময় সরকার বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছে।

ক্রমে আমরা জনবিরল কাটা-পাহাড়ের পথ ধরিলাম। আমি তখন হাঁপাইয়া পড়িয়াছি, তাঁহার সাথে সমানে তাল রাখিতে পারিতেছি না, তাহা দেখিয়া বলিলেন,—তুমি আমার এখানে দিন সাতেক থাকলে তোমার ভুঁড়ি কমে যাবে। আমি এখানে এসে প্রথম প্রথম আট দশ মাইল হেঁটেছি—এখনো চার মাইলের কম হাঁটি নে।

এই বার রাজনৈতিক আলোচনা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, দেখ. মিসেস বেসান্ত-এর 'বিলের' সঙ্গে আমার সব বিষয়েই মিল

আছে, কেবল ওঁরা 'সিবিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স' মানতে চান না, তা নিয়েই ত যত গোল। 'সিবিল ডিস্-ওবিডিয়েন্স' আমাদের লক্ষ্য না থাক্‌লে গবর্ণমেণ্ট কেবল মুখের কথা শুনবে না। আমি আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত (লর্ড রেডিং না ফেরা পর্য্যন্ত) দেখ্‌ব, পরে সারা বাঙলা ঘুরে দেশ 'সিবিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স'-এর জন্যে তৈরী করব। আমি বেসান্তকে বলেছি, তোমরা স্বরাজ্য ক্রিড-এ সই কর, নইলে 'অল-পার্টিস কন্‌ফারেন্সে' কি হবে? তার উত্তরে মিসেস বেসান্ত বলেছেন, শাস্ত্রী (শ্রীনিবাস শাস্ত্রী) ও সপ্রুকে (স্যর তেজ-বাহাদুর সপ্রু) না জিজ্ঞাসা করে কিছু বলতে পারবেন না।—বল্লেন, ওঁদের সাহস নেই, ওঁরা 'সিবিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স'-এর নামে ভয় পান।

এই বলিয়া তিনি বলিলেন,—আমার ফরিদপুর অভিভাষণ নিয়ে আমি 'মডারেট' বলে খুব হৈ চৈ হচ্চে, কিন্তু আমি যা বলেছি, তা কেউ বোঝে নি। আমি সহযোগ করতে চাই নি। যদি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয়েছে, কাজে দেখায়, তবে আমি সাময়িক truce করতে রাজী আছি। অভিভাষণেও আমি এই কথাই বলেছি। এই কথাই তোমরা বিশেষ ক'রে বল সকলকে, আমি সহযোগ করতে চাইছি, এগুলি আমার কথার distortion.

আর সে আগষ্ট মাস আসিল না!

পরে বলিলেন, ছ' মাস এখানে থাকলেই আমি ভালরূপ সেরে উঠব। কিন্তু আমার ত কিছুই নেই, একজনের গলগ্রহ হয়ে (তিনি তখন ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের অতিথি) কত দিন থাকি ? এখানে একটা বাড়ী না নিলেই চলবে না।—বই-টই লিখে চালাব।

যিনি দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছেন, রাজার ঐশ্বর্য্য দুই হাতে বিলাইয়াছেন, শেষজীবনে তাঁহাকে টাকার কথাও ভাবিতে হইয়াছে! কথাটা আমার প্রাণে তীরের মত বিঁধিল। আমি অনেকক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিলাম না। তাঁহার প্রশ্নে আমার চমক ভাঙিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—শিলিগুড়ি কেন যাচ্ছ ?

আমি বলিলাম, মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করিতে।

তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—তোমার মেয়ের বিয়ে! বয়স কত ?

আমি বলিলাম, চৌদ্দয় পড়িয়াছে।

তিনি বলিলেন,—এই তোমাদের সমাজ-সংস্কার! এই তোমার বোলশেভিকবাদ লেখা! তোমরা মনে মুখে এক নও। যা ভাব, তা করতে ভয় পাও।

আমি, বাড়ীর জেদ্, মায়ের পীড়াপীড়ি, ভাল বর হাত-ছাড়া হইয়া যায়—এ সব কৈফিয়ৎ দিলাম।

তিনি বলিলেন,—এ সব ত মামুলি জবাব, যদি বুঝে থাক যে, বাল্যবিবাহ দোষের, হাজার পীড়াপীড়িতেও তা দিতে পারবে না। ভাল বর সকল সময়েই পাওয়া যায়। যদি বামুনের মধ্যে না পাও, অন্য জাতের মধ্যে পাবে। অসবর্ণ বিবাহে দোষ কি ? এই বলিয়া নিজের ও নিজের ছেলে-মেয়েদের বিবাহের দৃষ্টান্ত দিলেন।

তিনি বলিলেন,—আমি যদি তিন শ' sincere বাঙালী ছেলে পাই, তবে দেশ-উদ্ধার, সমাজ-সংস্কার—সব কিছুই করতে পারি। তোমরা কাজ করবার আগে ভাব, কাজের ফলাফল বিবেচনা কর ; কিন্তু আমি তা কখনো করি নি। ফলাফল না ভেবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আমি কখনো আগু-পিছু ভেবে কাজ করি নে। এই বলিয়া তিনি তাঁহার রাজনৈতিক ও ব্যারিষ্টারী জীবনের কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—আমি ছিলেম কবি, হলেম ব্যারিষ্টার। তোমরা সকলে জান আমি মস্ত ব্যারিষ্টার, খুব আইন জানি। সে সব কিছুই নয়। 'ব্রিফ' পেয়েই আগে তোমরা আইনের পাতা ওল্টাতে থাক, আমি সবপ্রথমে আগাগোড়া 'ব্রিফ'-খানা পড়তাম। এরূপ বারবার পড়তাম, পড়তে পড়তে তার weak point চোখের সামনে ভেসে উঠত। তারই উপর আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতাম। এই বলিয়া তিনি মুসলমান-পাড়া বোমার মামলার দৃষ্টান্ত দিলেন। পরে বলিলেন,—জুনিয়র অবস্থাটা বড়
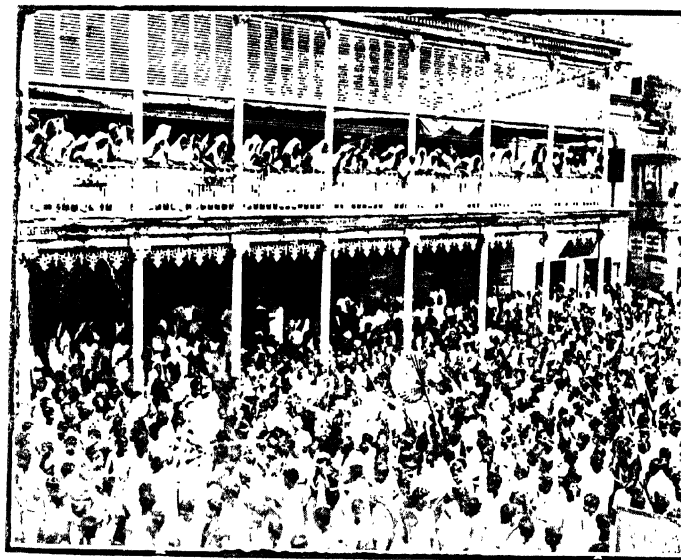
পুরনারীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

BANI PRESS, CALCUTTA

কষ্টকর, সিনিয়রদের snubbing খেতে হয়। তার উল্টো জবাব দিলেই মুখ বন্ধ।

এই সময় আমরা 'Gleneaden' ছাড়াইয়াছি। তিনি বলিলেন,—আমরা 'West Point' পর্য্যন্ত যাব। ওই দেখ, দিঘাপতিয়ার বাড়ী দেখা যাচ্ছে, সামনেই 'Recluse.'

তখন কুয়াশা নীচে নামিতেছে, ভাস্কর তাঁহার গায়ের ওপর কোটটা জড়াইয়া দিলেন। আমাদের অনুরোধে তিনি রিক্সতে চাপিলেন, আমি 'রাগ্' দিয়া তাঁহার পা-দু'খানি ঢাকিয়া দিলাম।

বিদ্যুতের আলো কুয়াশাকে দূর করিতে না পারিয়া অন্ধকারকে আরো গাঢ় করিয়া তুলিয়াছে। ঝিল্লীমুখরিত শান্ত বনানীর স্তব্ধ মৌনতা ভেদ করিয়া আমরা চলিলাম। তিনি বলিলেন, দার্জিলিঙের সবুজতায় চোখ জুড়ায়, হিমে মাথা ঠাণ্ডা রাখে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা West Point-এ আসিয়া পড়িলাম। তাঁহার ইচ্ছা তিনি কাটা-পাহাড়ে ওঠেন। আমি আর উঠিতে পারিব না বলায় সেখানে হইতেই ফিরিতে মনস্থ করিলেন।

রিক্সের দুই পার্শ্বে আমরা দুজন চলিতেছি, তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন,—দেখ, পলিটিক্সে surprise করতে হয়। আমি সব কাজেই surprise করেছি। আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত আমি চুপ ক'রেই থাকব। পরে ওদের দেখাব যে, আমি মডারেট, না আর কিছু।

ফিরিবার মুখে পথ একেবারে নির্জ্জন নহে, খেলা ধুলো-ফেরতা অসংখ্য ইউরোপীয় ইউরেশীয় বালক-বালিকারা দলে দলে বনানীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া হাস্য মুখরিত করিয়া চলিয়াছে, সকলেই সম্ভ্রমে তাঁহার জন্য পথ ছাড়িয়া দিতেছে। আমি বলিলাম, আমি আর রাত্রিতে 'ষ্টেপ এসাইডে' যাইব না, ষ্টেশন হইতেই ফিরিব। কিন্তু পথ চিনি না বলায় তিনি হাসিয়া বলিলেন,—ঠিক জায়গায় তোমায় ব'লে দেব।

পথে দুটি যুবকের সঙ্গে দেখা, তাঁহাদের তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, —ছাগলের জোগাড় হয়েছে কি না?—কারণ দু'দিন বাদেই মহাত্মাজী তাঁহার কাছে আসিবেন। ছেলে দুটি বলিলেন যে, একটি মাত্র জোগাড় হইয়াছে, আর হয় নাই। তখন তিনি আমাকে বলিলেন,—কাল ত তুমি শিলিগুড়ি যাচ্ছ, সেখান থেকে সোজা জলপাইগুড়ি যাবে, সেখানে গিয়ে তোমার ছাগল জোগাড় ক'রে পাঠাতে হবে।

এর পরেই আমি সে-দিনকার মত বিদায় হইলাম। আমায় বলিলেন,—কাল সকাল নয়টায় অবশ্য এসো, মিসেস বেসান্তের কাছে আমায় নিয়ে যেতে হবে।

শেষ

পরের দিন সকাল নয়টায় 'ষ্টেপ এসাইডে' পৌঁছিলাম, তখন তিনি ভিতরে চা খাইতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, একটু ব'স। চা-পান করিয়া বাহিরে আসিলেন। সামনে অনেকগুলি খবরের কাগজ পড়িয়া ছিল। মাদ্রাজ হইতে জনৈক মডারেট স্বরাজ্যনীতি সমর্থন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। পরে বলিলেন, দেখবে আজ যাঁরা আমাদের বিরোধী তাঁরা আর কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের সাথে যোগ দিবেন।

এই সময় আমার সহযোগে সম্পাদিত "বাঙলা" সাপ্তাহিক পত্রখানার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে বলিলেন, ব্যক্তিগত আক্রমণ না ক'রে humourously যদি তোমরা লেখ, অনেক কাজ হবে।

এই সময় তাঁহার রিক্স আসিয়া পৌছিল, তিনি বাহিরে যাইবার জন্য জামা-কাপড় পরিয়া আসিলেন। আমরা বাহির হইতেছি, এমন সময় নাড়াজোলের কুমারও তাঁহার সেক্রেটারী চারুবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রিক্স পিছন পিছন চলিতে লাগিল। তাঁহারাও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। চৌরাস্তা হইতে কুমার বাহাদুর বিদায় লইলেন। আমি আর চারুবাবু তাঁহার সঙ্গে চলিলাম।

স্যানিটারিয়ামে ডাক্তার শিশরবাবুর ওখানে মিসেস বেসান্ত উঠিয়াছেন। আমরা সেখানে চলিলাম। চৌরাস্তা হইতে সোজা পথ ধরিলাম। মিসেস বেসান্ত ও তাঁহার বিল সমন্ধে আলোচনা করিতে করিতে চলিলেন। বলিলেন,—দেখো, শীগ্‌গিরই সপ্রু-শাস্ত্রী আমাদের দলে আসবেন। Village organisation-এ দেরী হইতেছে বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং এই কাজটি যাহাতে শীঘ্র আরম্ভ হয় সে জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়দের বলিতে বলিলেন, আর দেরী করা সঙ্গত নয়। ইতিমধ্যে আমরা স্যানিটারিয়ামে আসিয়া পৌছিলাম। সেখানে প্রথমেই ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চিতা

BANI PRESS, CALCUTTA

সঙ্গে দেখা, তাঁহাকে বলিলেন,—আপনি এখানে কবে এলেন? আপনি না Recluse-এ ছিলেন?

ইতিমধ্যে শিশিরবাবু আসিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তখন প্রায় এগারটা। আমায় বলিলেন,—তোমার ট্রেন দুটোয়, তোমার ত আর দেরী করা চলে না। তুমি জলপাইগুড়ি গিয়ে অবশ্য ছাগল জোগাড় করবে আর সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম ক'রে আমায় জানাবে। আমি বলিলাম, আমি জলপাইগুড়ি কাহার কাছে যাইব? তিনি বলিলেন,—বার-লাইব্রেরীতে গেলেই জোগাড় হবে। ডাক্তার প্রমথনাথ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,—আপনি ঠিক বলেছেন, বার-লাইব্রেরীতে গেলেই ছাগল জোগাড় হবে। আমায় দেখাইয়া বলিলেন. একটির ত জোগাড় এখানেই হয়েছে, আর দুটি সেখানেই মিলবে!

তিনিও হাসিতে লাগিলেন।

আমি তখন প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। মাথায় হাত বুলাইয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন—তুমি এসো। টেলিগ্রাম করতে ভুলো না। এই বলিয়া তিনি শিশিরবাবুর সঙ্গে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সেই দিনই তাঁহার আদেশ মত আমি দার্জিলিঙ হইতে চলিয়া আসি এবং তাঁহার উপদেশ মত জলপাইগুড়ি গিয়া ছাগলের জোগাড় করিয়া টেলিগ্রাম করি।

তখন কে জানিত এই তাঁহার সহিত শেষ দেখা! তার দশদিন পরেই যখন এই নিদারুণ সংবাদ শুনি তখন প্রথমটা আমরা কেহ বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

এখনও মনে হয়, তিনি কোথায় যেন আছেন, তাঁহার সহাস্য মুখখানি আবার দেখিতে পাইব—যখন জাগিয়া থাকি, মনে হয় ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের ঘোরে যদি একবার দেখিতে পাইতাম! ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, মাঝে মাঝে মনে হয়, দূর—অতিদূর হইতে তাঁহার সেই অমৃত পরশ যেন দেবতার আশীর্ব্বাদের মত অনুভব করি!

বোলশেভিকবাদ

(অনুবাদ)

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী

ইউরোপের বিখ্যাত চিন্তাশীল মনীষী

বার্ট্রাণ্ড রাসলের

প্রসিদ্ধ পুস্তক বোলশেভিকবাদের

অভিনব বঙ্গানুবাদ

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের

ভূমিকা সম্বলিত

ও

বিখ্যাত চিত্র-শিল্পীগণের

চিত্র সমন্বিত

মূল্য বার আনা

কয়েকখানা নূতন বই

চিত্ত-কথারত্ন

ইংরাজী সংস্করণ

Reminicenses of Chittaranjan

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী

সকল প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়েই

পাওয়া যায়